RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume VIII, No. 1 / April, 2023, pp. 15-32.

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলায় বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও তার বিবর্তন

Aliul Hoque
Assistant Professor,
Department of Political Science,
Chakdaha College,
Chakdah, Nadia, India.
aliulpolsc@gmail.com

Structured Abstract:

প্রেক্ষাপট: এই গবেষণাপত্রটির আলোচনার ভৌগলিক প্রেক্ষাপট হল অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বঙ্গদেশ। কালের প্রেক্ষাপট হল অবিভক্ত বাংলাদেশে ইসলামের আগমন থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বকাল পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়গত পরিচয়ের নির্মাণ এবং বিনির্মাণ এবং এই আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়ায় কিভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পঠ পরিবর্তন হয়েছে সেই বৃহত্তর ক্যানভাস।

উদ্দেশ্য: এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল অবিভক্ত বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমন থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত কাল পর্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য চেতনার সূচনা এবং তার পরিবর্তিত রূপকে চিহ্নিত করা। অবিভক্ত বাংলাদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী কিভাবে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করল এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেকে তুলে ধরল তাকে পর্যালোচনা করা। ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র প্রবাহ কে চিহ্নিত করা এবং এই স্বতন্ত্র প্রবাহ কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রভাবিত করেছে বা স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা প্রভাবিত হয়েছে তাকে বোঝার চেষ্টা করা। সনাতনী ভারতীয় সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত জাতিভেদ প্রথার প্রভাব মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পড়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা। সপ্তম অষ্টম শতক থেকে ইংরেজ শাসনের পূর্বে পর্যন্ত এবং ইংরেজ শাসনের কালে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করা। মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রাক

ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজ শাসনকালে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল কিনা জানার চেষ্টা করা। বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ ওহাবী ও ফরাজী আন্দোলন এর মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্মচেতনা বা আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিনা বোঝার চেষ্টা করা। মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কিভাবে নানা দিকে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করা। বিভিন্ন মুসলিম স্বার্থ গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গত চেতনাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা বিশ্লেষণ করা এবং সবশেষে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাঙালি সত্তা এবং মুসলিম সত্তার দ্বৈততাকে পর্যবেক্ষণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি: সামাজিক ব্যাক্ষ্যামূলক এই গবেষণা পত্রটির গবেষণা পদ্ধতি হলো বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

ফলাফল: এই গবেষণাপত্রটিতে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে অবিভক্ত বাংলাদেশে মুসলিম সত্তার কোন একটি নির্দিষ্ট পরিচয় নেই। এর একদিকে যেমন একাধিক বিভাজন আছে তেমনি একাধিক বিভাজিকা ও রয়েছে। এই মুসলিম পরিচয় আত্মমর্যাদা এবং আত্মচেতনা প্রতিষ্ঠার নানা পর্বে নানা রূপ লাভ করেছে। ভাষাগত বিভাজনও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতার লগ্নের দিকে যত বেশি এগিয়ে গেছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুটি স্পষ্ট মেরু গাড়ো থেকে গাড়ো তর হয়েছে। একটি প্রবাহ ধর্মনিরপেক্ষ আত্মপরিচয়ের সন্ধানে এগিয়েছে অন্য প্রবাহটি সাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা পুষ্ঠ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে প্রত্যয়ী হয়েছে।

Paper Type: গবেষণা পত্র (Research Paper)।

সূচক শব্দ (Keywords): ইসলাম, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ওয়াহাবি, ফরাজী, কৃষক বিদ্রোহ।

ভূমিকা

আলোচনার মূল অংশে প্রবেশের পূর্বে আলোচ্য বিষয়টির শিরোনামে উল্লিখিত বাংলা, বাঙালি, বাঙালি মুসলমান, এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা করে নিলে এই

আলোচনায় সুবিধা হবে। আদিতে বাংলার নাম ছিল 'বং' তার সঙ্গে 'আল' যোগ করে হয় 'বংগাল'। প্রাচীনকালে বাংলার মানুষ পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে উঁচু উঁচু স্তুপ তৈরি করে তার উপর বাড়ি বানাত ও চাষাবাদ করত বলে এগুলোকে বলা হত বাংলা। আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরী তে বাংলা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া তবকাত-ই-নাসিরী তে 'বঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তারিখ -ই- ফিরোজশাহীতেও 'বঙ্গালা' বা 'বেঙ্গল' শব্দ দেখা যায়।

নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস

বাঙালিরা বঙ্গদেশে কবে থেকে বসবাস শুরু করেছিল আর কবে থেকে এই সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর না হলেও যথেষ্টই কষ্টকর। তবে বাংলায় প্রস্তর যুগের ও তাম্র যুগের যে অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক কালে বাঙালিরা যে সমমানের অধিকারী ছিল তার প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা প্রায় অপ্রতুল বলা যায়। তবে এটুকু জানা যায় যে বঙ্গদেশর আদি অধিবাসী ছিল আদি- অস্ত্রালয়রা। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সাথে দৈহিক কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায় বলে এদের আদি অস্ত্রাল বা প্রোটো অস্ট্রালয়েড বলা হয়। বাংলায় সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি যেসব উপজাতি আছে তারা এই আদি অস্ত্রাল দেরই উত্তরসূরী। এই সমস্ত উপজাতিরা যে ভাষায় কথা বলে তা অস্ট্রিক ভাষা থেকেই সৃষ্ট। বাংলায় আদি অস্ত্রাল দের সাথে প্রথম যাদের সংমিশ্রণ ঘটে তারা হল দ্রাবিড় ভাষী মধ্য - ভূমধ্য গোষ্ঠীর মানুষ। তারপর বঙ্গদেশে পদার্পণ করে আলপীয়রা। এরা মূলত ইউরোপয়েড দক্ষিণ ইউরোপীয় বা ভূ-মধ্য ভারত জাতীয় গোষ্ঠী- এরা আর্য ভাষী হলেও বৈদিক আর্য ভাষীদের থেকে আলাদা। এই সময় মঙ্গোলিয়ান রক্ত ও এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। যার নমুনা এদেশের কোচ, পলিয়া, রাজবংশী, চাকমা ও জুমিয়াদের মধ্যে দেখা যায়। নর্দিক নরগোষ্ঠীর মানুষ বাংলায় আসে আরো দীর্ঘ সময় পরে। মৌর্য শাসন কালে বাংলায় উত্তর ভারত থেকে কিছু মানুষ শাসনকার্যে এসে যুক্ত হয় তাদের সাথে কিছু আর্য ভাষী ও বর্ণাশ্রমবাদী ব্রাহ্মণধর্ম বাংলায় প্রবেশ করে। গুপ্ত যুগে উত্তর-পূর্ব বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে সেন ও বর্মন রাজাদের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়। মঙ্গলয়েড

গোষ্ঠীর মানুষ ও এই বাংলায় এসেছিল। বর্তমান বাংলাদেশের চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা তাদের বংশধর। নৃতত্ত্ববিদরা আধুনিক বাঙ্গালীদের নাক এবং মস্তিষ্ক গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেন যে বাঙালিরা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। অনেকে ব্রাহ্মণ তথা উচ্চ জাতকে আর্য সংমিশ্রণ বলে মনে করেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে সেমেটিক রক্ত বাংলার মাটিতে অনুপ্রবেশ করে। পাহাড়পুরে পাওয়া খলিফা হারুন আল রশিদের মুদ্রা এটা প্রমাণ করে যে সেমেটিক আরবরা ওই সময়ে দেশে বাণিজ্যের জন্য এসেছিল। তারপর এদেশে আসে আফ্রিকার নিগ্রোরা। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বাংলায় নিগ্রো সুলতানরা রাজত্ব করেছে। এভাবে নিগ্রাইট রক্ত বাঙালির রক্তে মিশে গেছে উদাহরণস্বরূপ কুচকুচে কালো, কোঁকড়ানো চুল, পুরু ঠোট আমাদের মধ্যে দেখা যায়।তবে বাঙালিকে জাতি নির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফসল বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে শক- হুন দল, পাঠান- মুঘলদের রক্ত ও বাংলার মানুষের সাথে মিশেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে বাঙালি জাতি মূলত অনার্য বংশোদ্ভূত। প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার মানুষ প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ, অন্ত্যজ শ্রেণীর অধিবাসী এবং জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত ছিল। প্রথমে জৈন রা বিলুপ্ত হয়। সেন রাজবংশে বৌদ্ধদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়।[সূত্র:বাঙালি ও ইসলাম, সাদ উল্লাহ]

বাংলায় ইসলামের আগমন

বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে আরব বণিক এবং সুফি সাধকদের হাত ধরে খ্রিস্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতকে (খলিফা হারুন অর রশিদ ৭৫৬-৮০৯)। প্রাথমিকভাবে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে প্রধানত সুফি সাধকদের মাধ্যমে, ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নয়, পীর, দরবেশের কেরামতি আর প্রভাবে। এই সুফি সাধকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বায়েজিদ বোস্তামী (৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), মীর সৈয়দ সুলতান মাহি শাওয়র (১০৪৭ খ্রিস্টাব্দ), শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমি (১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ), বাবা আদম শহীদ (১১১৯ খ্রিষ্টাব্দ) শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুৎশিকন এবং হযরত শাহজালাল প্রমূখ। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে বাংলার সাথে যে ইসলামের পরিচয় ঘটে তা হল মারিফত পন্থী আধ্যাত্মবাদী সুন্নি সুফি ইসলামী সংস্কৃতির। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি প্রশাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে বিদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা হয়। তখন থেকে ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশো

বছর অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান সুলতান – সুবেদার – নবাব - নাজিম বাংলাদেশ শাসন করেছে। মাঝে রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮) চার বছর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন। রাজা টোডরমল (১৫৮০-১৫৮২) এবং মানসিংহ ও (১৫৮৯-১৫৯৬) বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন তবে তাঁরা ছিলেন মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি- নাজিম। শের শাহের (১৫৪০-১৫৪৫) আমলে বাংলা কিছুদিন দিল্লির অধীনস্থ থাকে। মুসলমান শাসকের আমলে বনিক ও পীর, দরবেশর সঙ্গে সঙ্গে বেতনভোগী তুর্কি সেনাদের আগমন এবং বাসস্থান গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলায় মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইসলামের প্রসার বাড়ে। তুর্কি বিজয়ের পরে বাংলাদেশ পীর, দরবেশ সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ধর্মান্তরিতকরণও ত্বরান্বিত হয়। এক্ষেত্রে উচ্চ পদ, ব্যবসার সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, এবং কোথাও কোথাও তরবারির ও উপস্থিত হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের মত বাংলাতেও দেখা যায় Religion follows the flag - অর্থাৎ ধর্ম রাজ শক্তির অনুসরণ করে; বা রাজ শক্তির সাহায্যে ধর্মের উত্থান পতন বাংলাদেশে ইউরোপীয় এই প্রবাদ অনেকাংশেই বাস্তবায়িত হয়। দিল্লির নাগরিক জীবনে বিপর্যয় জীবন ও সম্পত্তি নিরাপত্তার কারণে একটি স্রোত বাংলাদেশে প্রবেশ করে যারা পরবর্তীকালে আর দিল্লি তে ফিরে যায়নি বসতি এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় থেকে যায়। এক কথায় শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক, বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃষ্টি সূত্রপাত এবং বৃদ্ধি হয়েছে। বঙ্গদেশে ইসলামের প্রচার এবং মুসলমান সমাজের গোড়াপত্তন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া দ্বারায় বাঙালি মুসলমানের গঠন ও বিকাশ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হিসাবে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতিভেদ প্রথার কারনে নিম্নবর্ণের জনগণের ব্যাপক হারে ধর্মান্তরণ কে হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রচারযন্ত্র হিসাবে পীর-দরবেশ অলি-আউলিয়াগন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যদিকে খন্দকার ফজলে রাব্বী তার 'হাকীকতে মুসলমানি বাঙ্গালাহ' গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত, অভিজাত শ্রেণীর লোক। তিনি আরো বলেছেন মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় সমাজে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বেশি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি তে পরিণত হয় এবং বিংশ শতাব্দীতেও মুসলিম জনসংখ্যা

বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকে। রাধা কমল মুখোপাধ্যায় বাংলার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ব্রাহ্মণ সমাজের নানা ত্রুটির ফলে হিন্দুসমাজ বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তার একটি সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন। কারণ হিসাবে তথাকথিত পুরনো শহর গুলির জৌলুস কমে যাওয়া, বাংলার বিভিন্ন নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার ফলে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। জীর্ণ নদী গুলির পার্শ্ববর্তী এলাকায় ম্যালেরিয়া মহামারী প্রকোপ। এসব স্থানে রাস্তা ও রেলপথ, জল নিকাশের প্রতি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি যেসব স্থানে অবাধে জলপ্লাবন হয় সেসব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকল্প অপেক্ষাকৃত কম এই কারণে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে লোক সংখ্যা শতকরা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে বঙ্গপ্রদেশের জেলাগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাস পায় অথবা বৃদ্ধির মাত্রা খুবই অল্প হয়। এইভাবে প্রাচীন জনপদ গুলির হয় এবং নতুন জনপদ গঠনের প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করলে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে যেসব জনপদ গুলি বিলুপ্ত হয় অথবা যে অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেই সমস্ত স্থানে হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের প্রাধান্য ছিল অন্যদিকে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের জেলা গুলির বেশিরভাগ স্থানে নিম্নবর্ণের হিন্দু অধিবাসী ও মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল এর ফলে প্রাচীন জনপদের উচ্চবর্ণের হিন্দু সংখ্যা হ্রস আর মুসলমান সম্প্রদায় ও অনুন্নত হিন্দু বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি বাংলার কৃষ্টিকে অন্য পথে পরিচালিত করে। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লেখেন "ব্রাহ্মন সমাজের জাতিভেদ, বংশ ভেদ, বিবাহের অতি সংকীর্ণ গণ্ডি স্থাপন, বিধবা বিবাহ নিষেধ, পণপ্রথা ও আরো অনেক সামাজিক বিধিনিষেধের ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়"। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পীড়নের ফলে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনেক নিম্ন বর্ণের হিন্দু ইসলাম অথবা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লোক সংখ্যা হ্রস বৃদ্ধির বিষয়টি সামগ্রিকভাবে ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ না করলে আলোচনাটি যথার্থ হয় না। তাই মুসলিম জনগোষ্ঠীর উত্থান, বিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি এই প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করা ভীষন জরুরী। কারণ বাংলাদেশ লোকসংখ্যার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে এমনভাবে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হয় যার ফলে অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা থেকে বিষয়টিকে একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এর পথে পরিচালিত করা হয়। এর ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিজেদের ধর্ম বিপন্ন, এই প্রশ্ন তুলে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষকে জীবিত রাখে।

বাংলার মুসলিমরা গোড়া থেকেই বেশিরভাগই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং হানাফী মতাবলম্বী এরাও আবার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মত কয়েকটি মর্যাদাগত স্তরে বিভক্ত মূলত যার ভিত্তি বংশমর্যাদার কৌলিন্য এবং পেশা। যেমন- ১ আশরাফ (Ashraf) বা উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ মুসলমান আরবি 'শরীফ' শব্দের অর্থ পবিত্র, মান্য শরিফের বহুবচন আশরাফ; শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান, মল্লিক, মির্জা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ২ আতরাফ (Atraf) বা মধ্য শ্রেণীভূক্ত; অনুরূপভাবে 'তরফ' (শ্রম) শব্দজাত আতরাফ ৩ আজলাফ (Ajlaf) 'জিলফ' (নীচ) শব্দজাত আজলাফ; পেশা অনুসারে এই শ্রেণীর মুসলিমরা আবার চারটি ভাগে বিভক্ত। এরা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান। ৪ আরজল (Arzal) 'রযীল' (ইতর) শব্দ জাত আরজল; অবনমিত শ্রেণীর মুসলমান। শেষ তিনটি শ্রেণীর (আতরাফ, আজলাফ, আরজাল) মুসলিমদের ধর্মান্তরিত দেশীয় অধিবাসী হিসেবে গণ্য করা হত। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান ও আছে। আর আছে মোহাম্মদিয়া বা ফরাজী, ওয়াহাবি এবং সুফি সম্প্রদায়ের মুসলিম। নীতিগতভাবে ইসলামে বর্ণ বৈষম্য হীন সাম্যবাদ ও মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্দেশ থাকলেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়নি বাংলার ক্ষেত্রেও এটা সমানভাবে সত্য। তাই নবগঠিত মুসলমান সমাজ কাঠামোর স্পর্শে ভারত তথা বাংলার বর্ণবৈষম্যবাদ উবে যায় নি। বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্বর্ণের নাম পরিবর্তন করে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ, আরজল নাম গ্রহণ করে। কারণ এক্ষেত্রে সামাজিক মেলামেশা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং আহার- বিহারের ক্ষেত্রে এই ভেদাভেদ কঠোরভাবে পালন করা হত। কোন কোন ইংরেজ লেখকর কথায় আরজল শ্রেণীর মুসলিমদের মসজিদে প্রবেশ এবং সাধারন কবরস্থানে মৃতদেহ দাফন করতে পেত না। তবে একথা সত্য হিন্দু জাতিভেদের মত ইসলামের এই ভেদাভেদ এবং বিধি নিষেধ যথেষ্ট কঠোর হলেও দুর্ভেদ্য, দূরতিক্রম্য, অলঙ্ঘনীয় ছিল না। শ্রেণি গুলির মধ্যে সামাজিক সচলতা অবরুদ্ধ না হওয়ায় নিম্ন শ্রেণীর থেকে উচ্চ শ্রেণীতে ওঠার পথ খোলা ছিল। তবে এই কঠোরতা অঞ্চলভেদে এবং সময়ের সাথে সাথে অনেকাংশেই প্রশমিত হয়। তবে এই ভেদাভেদ যে যথেষ্টই কঠোর ছিল তা প্রমাণিত হয় নিম্নশ্রেণির মুসলিমদের উচ্চশ্রেণীর মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা থেকে।

জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ

ইউরোপে পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে উদ্ভূত এবং বিকশিত আধুনিকতার ফসল হল জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণ ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সমরূপি না হলেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই জাতীয়তাবাদ ইউরোপীয় বিভিন্ন বিশ্লেষক এবং দার্শনিকদের (Ernest Gellner, Ernest Hass, Michael Ignatieff, Ghia Nodia, Anthony Smith,Yael Tamir, Will Kymlicka, Thomas Blank, Peter Schmidt, Benedict Anderson, Michael Billing John H Kautsky, Joseph Stalin) আলোচনায় যে ধারণাগত কাঠামো লাভ করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই এবার বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর জাতী চেতনার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের যে মডেলটি বিকশিত হয়েছিল তাহলো মূলত এক ভূখণ্ডে বসবাসরত এক ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, ঐতিহ্য, জীবন ব্যবস্থা, প্রচার, আচার-ব্যবহার, একই প্রকার আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে অবস্থানকারী সম্প্রদায়ের মানসিক, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং একাত্মবোধর অনুভূতি। প্রথম পর্যায়ে বাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠী বলতে যাকে বোঝানো হয় তাদের মধ্যে এক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া ছাড়া তাদের মধ্যে ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের কোন ঐক্য ছিল না। পূর্বে আলোচিত মুসলিম সমাজের মধ্যে কার যে বর্ণভেদ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চে অবস্থিত 'আশরাফ' সম্প্রদায় নিজেদের বিশুদ্ধ মুসলিম বলে মনে করতেন এবং বাকি মুসলমান সম্প্রদায় থেকে নিজেদের আলাদা রাখতেই পছন্দ করতেন এবং বাংলার অন্যান্য মুসলিমদের ছদ্দবেশী হিন্দু ভাবতেই পছন্দ করতেন (এমনকি বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈনিকদের এই ভাবনা তেই বাঙালি মুসলিমদের আক্রমণের মন্ত্রণা দেওয়া হয়)। সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের ভাষা ছিল প্রধানত আরবি, ফার্সি এবং উর্দু। বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা বলে তার প্রতি প্রতি এরা ঘৃণা প্রদর্শন করতেন। আপামর কৃষিজীবী মুসলিমের ভাষা ছিল বাংলা। সম্ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায় ছিল জমিদার শ্রেণীর আর বাকি মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল নিম্নবিত্ত কৃষক।মুসলিম সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী অর্থে আশরাফ শ্রেণীতেই বোঝাত। এরা আরবি- ইরানি- তুর্কি প্রভাবিত সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করত। অন্যদিকে নিম্ন শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা এ দেশের বাসিন্দা হওয়ায় তাদের

সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপ্রতীপ অবস্থানে থাকার কারণে এদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সমন্বয় ও সম্ভব ছিল না।

১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা রাজধানী স্থানান্তর এবং বাংলায় পরিপূর্ণরূপে ইংরেজ শাসনের সূচনা মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশেষ করে অভিজাত মুসলিমদের উপরে বিশেষ প্রভাব ফেলে। সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপরে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা যে ব্রিটিশ শাসনে বাংলার মুসলমান সমাজের অবক্ষয় নেমে আসে এরমধ্যে সত্যতার খাদ যথেষ্টই বেশি কারণ মুসলমান শাসকের আমলেও সাধারণ বাঙালি মুসলমান জনগণের অবস্থা মোটেই ভাল ছিলনা। চাকুরি ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত মুসলমানরা শাসন ক্ষমতা হারানোর পর তারা বেশিরভাগই খ্রিস্টান ইংরেজ শাসকদের অধীনে না থেকে গ্রামে এসে কৃষি কাজে যোগদান করে। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বিচার বিভাগে নিযুক্ত মুসলিমরা কিছুদিন সেই কাজ চালিয়ে যেতে পারেন কিন্তু ইংরেজ শাসনের আরবি-ফারসি এবং উর্দু ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রচলন শুরু হলে সেই সমস্ত পদগুলিতে মুসলিমদের একচেটিয়া উপস্থিতি অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। যেহেতু উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমরা প্রধানত আরবি উর্দু এবং ফারসি ভাষায় শিক্ষালাভ এবং পারদর্শী ছিল ফলে ইংরেজ শাসনের তাদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ কমতে থাকে। আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গতি ছিল ভিন্নমুখী ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা লাভ এবং ইংরেজী শিক্ষার ধারা চাকরিতে সুযোগ গ্রহণ করে হিন্দুরা উন্নতির দিকে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখ থেকে চাকরি ও ব্যবসার সুযোগ হারিয়ে মুসলমানরা অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। হিন্দুরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবস্থার সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিলেও মুসলিমরা তা পারেনি। লর্ড হেস্টিংস এবং কর্নওয়ালিসের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম জমিদারদের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে রাজ ক্ষমতা হারানো, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে ভূমির রায়তিসবত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে রাজভাষা থেকে ফারসি পদচ্যুতি অভিজাত ও মুসলিম শ্রেণি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ হিন্দু-মুসলিম মিলিত স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ হলেও ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল

মুসলমানদের রাজ্য হারানোর ক্ষোভ ই ছিল সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান কারণ ফলে মুসলিমদের প্রতি তাদের মনোভাব আরো কঠোর হয়। ১৮৩৭-১৮৬৩ সাল পর্যন্ত সময়কাল শহুরে বাংলায় মুসলমান সমাজের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় বলা যায়। বিপরীতক্রমে হিন্দু সমাজে এই সময় থেকেই আধুনিক জীবনের মূল্যবোধগুলো শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়। এককথায় হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে হিন্দুসমাজ এগিয়ে যায়, পিছিয়ে পড়ে মুসলমান সমাজ। এই পর্বে যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম ব্যক্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় তারা হলেন গোলাম নবী, মোহাম্মদ আমির, হাবিবুল হোসেন, আমিনুদ্দিন, শাহজাদা জালাল উদ্দিন, মুন্সি ফজলুল করিম এবং আব্দুল লতিফ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে কলকাতা থেকে মুসলিম জনবহুল এলাকা গুলির দূরত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল গুলির দূরত্ব কলকাতা থেকে অনেক বেশী হওয়ায় এই নবজাগরণের প্রভাব থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হয় তার প্রভাব মুসলিম সমাজে পড়ে। শ্রীরামপুর ছাপাখানা কলকাতায় কম্প্রেসার কল কাপড় সেলাইয়ের কল শ্রীরামপুরে পাটকল কাপড় তৈরীর কল রেললাইন স্থাপন টেলিগ্রাফ আমদানি-যন্ত্র যুগের ও যন্ত্র শিল্পের পদধ্বনি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সেভাবে ধ্বনিত হয় নি তার ফলেও বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী শিল্প বিপ্লবের প্রভাব গায়ে মাখতে পারেনি।তবে এই কাল পর্বেই গ্রামের মুসলিমসমাজ বাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর সচেতনতা উন্মেষের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

কৃষক বিদ্রোহ, ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ (পাবনা কৃষক বিদ্রোহ-১৮৭৩, তুষখালী কৃষক বিদ্রোহ-১৮৭২-৭৫, তারিকা - ই – মোহাম্মদিয়া (এর অর্থ হলো মোহাম্মদের পথ ফরাজী এবং ওহাবী দুটি আন্দোলনই একই সময় (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে) শুরু হয় দুটি উদ্দেশ্য ছিল অ-ইসলামীয় আচরণ পরিহার করে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। এর অন্যতম নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমেদ ও শাহ ইসমাইল, মীর নিসার আলী তিতুমীর) বা ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরাজি আন্দোলন-১৮৮০। আরবি শব্দ ফরাইজ থেকে

ফরাইজী শব্দের উদ্ভব, এর থেকেই ফরাজী শব্দের প্রচলন। ফরাইজি শব্দের অর্থ হলো ইসলাম নির্দিষ্ট "বাধ্যতামূলক কর্তব্য"। বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই ফরাজি আন্দোলনের সূচনা হয়। জাঁকজমক পরিহার করে ইসলামের শুদ্ধতা রক্ষা করে কোরআন নির্দিষ্ট একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ, তার পুত্র মহসিন আলদীন আহমেদ বা দুদু মিঞা) আন্দোলন গ্রাম বাংলাকে সিঞ্চিত করে এই আন্দোলন মূলত উপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে যুক্ত সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় তাই এইসব আন্দোলনের উপনিবেশ বিরোধী ও সামন্ত প্রথা বিরোধী চরিত্র মুসলিম সমাজের সম্প্রদায়গত ঐক্য চেতনার সঞ্চার করে। তবে এই বিদ্রোহ এবং আন্দোলন গুলির সঙ্গে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন আত্মিক যোগ ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট এবং ব্রিটিশ শাসনের ওপর নির্ভরশীল এই শ্রেনীর পক্ষে কৃষক বিদ্রোহ কে নেতৃত্ব দেওয়া অথবা সহানুভূতি প্রদর্শন করা কোনটাই সম্ভব ছিল না বরং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ধর্মের চাদরে মোড়া এই আন্দোলন গ্রাম বাংলায় মুসলমানদের এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের হতাশা দূর করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন অনেকটা সহায়তা করে। তবে এই ধর্ম সমাজ আন্দোলন বহুমুখী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় জটিল রূপ ধারণ করে যার প্রভাব সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে। ইসলামীকরণ এবং আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তন এই আন্দোলনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা আসলে এই আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষিত মুসলিমরা একটি সুস্পষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়। ইসলামী করণের মাধ্যমে তারা সাধারণ মুসলিমদের ওপর নিজেদের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে তৎপর হোন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে এই আন্দোলন জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় আর জমিদার শ্রেণীর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল হিন্দু এর ফলে এই আন্দোলন প্রভাবশালী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে অগ্রসর বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম কৃষকের আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত হয়। সরল সমীকরণ এর দাড়াই হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলিম কৃষকের বিদ্রোহ। যা শেষ পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সুদুরপ্রসারি ক্ষত সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন মুসলিম সমাজের মধ্যে আত্মসচেতনতা এবং আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেও সাম্প্রদায়িকতার পরিখাও নির্মাণ করে। তবে

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ফরাজী ওয়াহাবি আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রূপ নেয় ঠিকই তবে পরবর্তীকালে ওয়াহাবি আন্দোলন তার এই দুর্বলতা সংশোধন করে। মনে রাখা প্রয়োজন ওয়াহাবিরা সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ বিতরনের জন্য দীর্ঘ দিন ব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রথমদিকে শিখদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলনের অভিমুখ নির্দেশিত হয়। এই আন্দোলন দুটিতে অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে শ্রেণী-সংগ্রামের উপাদান পাওয়া যায় আর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুসলিমদের মধ্যে কার বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন এবং মুসলিম জনসংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ তথা হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন মুসলিমদের সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু করেন তার ফলে হিন্দু নেতৃত্তের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারই ফসল ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান। এর অন্যতম সমর্থক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয় কুমার সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিষ্ণু প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জয়গোবিন্দ সোম, মনোমোহন বসু, গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ।

মুসলিম স্বার্থ গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী চেতনা

ব্যক্তিগত এবং যৌথ প্রচেষ্টায় মুসলিম স্বার্থ সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম হয় প্রথম সংগঠন হিসেবে মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫৫), পরবর্তীকালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩) ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৮) ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী গড়ে ওঠে। মফস্বল শহরগুলোতেও এই ধরনের সভা-সমিতি তৈরি হতে থাকে। সামগ্রিকভাবে পুরো মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি না করলেও মুসলমানদের মধ্যে অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা, সংহতিবোধ এবং সমাজ মুখী চিন্তাধারা প্রসারিত হয় এইসব সংগঠনের মাধ্যমে। শিক্ষা বিস্তার ধর্ম ও সমাজ সংস্কার এই সমস্ত সংগঠন গুলির প্রধান কর্মসূচি থাকলেও কোন

কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এই সময় থেকেই প্রকৃত অর্থে বাঙালি মুসলিম বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করে। এর আগে মুসলিমদের একটি বড় অংশ বাঙালি ছিলেন তবে তাদেরকে আরেকটি অংশ মুসলিম মনে করতেন না আর যারা নিজেদের মুসলিম মনে করতেন তারা কোন ভাবেই নিজেদের বাঙালি ভাবতেন না। মুসলিম সমাজের বাংলা ভাষার প্রতি নৈকট্য মুসলিম সমাজের মধ্যেকার এই বিভেদ রেখাকে অনেকাংশেই মুছতে সাহায্য করল এবং জনগোষ্ঠি হিশাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করল। এই চেতনা খন্ডিত হলেও মুসলমান সমাজের মধ্যে পরিবর্তন এনেছিল। এরমধ্যে যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা প্রতিফলিত না হলেও সম্প্রদায়গত মনোভাব, ধর্মবুদ্ধি ও স্বার্থ চিন্তা স্থান পেয়েছিল। ফলস্বরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির বদলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতি ঝুঁক নির্দিষ্ট হয়। সমগ্র বাঙালি জাতির অভিন্ন স্বার্থে পরিচালিত না হওয়ায় বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যে জাতীয়তাবাদের প্রসার বাংলায় ঘটে তারমধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সম্মেলন ঘটেনি তাকে খুব জোর আমরা বলতে পারি দ্বিখন্ডিত, দ্বিধাগ্রস্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তা ও মুসলিম জাতীয়তার পুনরুত্থান।

ইংরেজ শাসনের গতিবিধি এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদ

এই সময়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর অংশটি ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন না হয়ে বরং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সরকারি চাকরি তথা রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে তৎপর হয়। প্রথমদিকে বাংলার মুসলিমরা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং কংগ্রেস কে সন্দেহের চোখে দেখে এবং হিন্দুদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন গুলিতে যোগদানকারী সদস্যদের মধ্যে মুসলিম প্রতিনিধিদের সংখ্যা দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ঘোষিত হলে অগ্রসর হিন্দু সমাজ এবং মুসলমান সমাজের একটি অংশ ক্ষুব্ধ হলেও অনগ্রসর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ এমনকি অধিকাংশ তফসিলি হিন্দুরা বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নমঃশূদ্র জাতি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেনি। নবগঠিত প্রদেশের হিন্দু প্রভাব মুক্ত হয়ে মুসলমানদের

উন্নতির সহায়ক হবে বলে মনে করে। মৌলভী, মোল্লা, মুন্সি, ক্ষুদ্র সরকারি কর্মচারী, মোক্তার, সম্পন্ন কৃষক যাদের সাথে গ্রামবাংলার সাধারণ মুসলিমদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তারা দরিদ্র মুসলিমদের অর্থনৈতিক ক্ষোভকে ধর্মীয় অস্ত্রের সাহায্যে হিন্দু জমিদার মহাজন' আইনজীবী প্রকৃতির বিরুদ্ধে পরিচালনা করে এর ফলে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সমর্থন লাভ অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। সম্প্রদায়গত ভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের বিশেষ অধিকার এবং সুবিধা সুনিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা বা সংঘাতের পরিবর্তে ইংরেজ সরকারের উপর নির্ভরশীলতায় মুসলিমদের জন্য উপযোগী- এই বিশ্বাস ইংরেজ শাসক বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে জারিত করতে চাইছিলেন বিভিন্ন আইন এবং সংস্কারের (কাউন্সিল অ্যাক্ট, মর্লি মিন্টো সংস্কার) মাধ্যমে।এর মাধ্যমে শুধুমাত্র মুসলিমদের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার হয়েছিল তাই নয় (মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা - ১৯০৬) সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দুর্বল হয়েছিল এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা (হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা, সশস্ত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু দেব দেবী প্রভাব) এবং কংগ্রেস এর মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভঙ্গ এবং তার পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তার তার ফলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদুরপ্রসারি এবং গভীর প্রভাব ফেলে। বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও এর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর প্রবেশের প্রথম পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গন চরিত্র লাভের প্রথম পর্বে ব্রিটিশ বিরোধিতার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিমদের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হলেও ধর্মও রাজনীতির পরিসরে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে যথেষ্ট অবনতি ঘটলেও সাইমন কমিশন বয়কট কে কেন্দ্র করে তা কিছুটা উন্নত হয়। ত্রিশের দশকের শুরুতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা হিন্দু এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় খাদের জন্ম দেয়। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে কালপর্বে শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদে সাম্প্রদায়িক প্রভাবকে অনেকটাই প্রশমিত করতে পেরেছিল যার ফলে শ্রমিক

এবং কৃষক আন্দোলন গুলি সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে অনেকটাই তফাৎ তৈরি করতে পেরেছিল। বাংলায় কৃষক আন্দোলনের চরিত্র এ ক্ষেত্রে অনেকটাই সাম্প্রদায়িক চেতনা ঊর্ধ্বে উঠেছিল। ত্রিশের দশকে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম লীগের গ্রহণযোগ্যতাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভাজিত হয়ে পড়ে তার ফলে মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক চেতনার বদলে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থই নিজেদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষ প্রান্তে এসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সার্থক ও আঞ্চলিক স্বার্থ এবং ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত ভারতবর্ষের রাজনীতিকে এমনভাবে একটি জটিল আবর্ত রচনা করেছিল যার মধ্যে ভারতীয় জনগণের ঐক্য রক্ষার সম্ভাবনা ক্রমাগত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল উপরন্তু ব্রিটিশ শাসকের ভূমিকায় এমনভাবে পালিত হচ্ছিল যাতে সম্প্রদায়গত প্রশ্নটিই প্রতিদিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় এবং কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক কাঠামো এবং মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক কাঠামোর মধ্যে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চেতনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থতা এবং কংগ্রেসের সমগ্র ভারতে হিন্দু-মুসলমানের একক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে না পারার ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রশ্নটিই আবার ফিনিক্স পাখির মত পুনর্জন্ম লাভ করে। ইংরেজ শাসন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ রাখার কৌশল হিসাবে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি কে এই রুপে বজায় রাখাই শ্রেয় মনে করে। এই উদ্দেশ্যেই তারা "কখনও হিন্দু, কখন মুসলমান, কখনো কংগ্রেস, কখনো মুসলিম লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন অথবা তা প্রদর্শনর ইঙ্গিত প্রদান করে ভারতের দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনগণকে প্রতিদিনই অধিক থেকে অধিকতর বিভক্ত ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল" (অমিও কুমার বাগচী: প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া)। এই পথ ধরেই বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলিমদের দাবি হিসেবে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান সমাধান হিসেবে তুলে ধরার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যা আসলে ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনায়াসে শ্রেণীগত বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা। এই শ্রেনীর স্বার্থেই কৌশল ও প্রচার এর দ্বারা বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়ে ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনা হল তারই একটি অতি উজ্জ্বল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। এই পরিসরে বাঙালি

মুসলিমরাও একই ভাবে প্রভাবিত এবং পরিচালিত হয়। তবে এই পর্বে বামপন্থী আন্দোলন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র এবং নজরুলের ভাবনায় সম্প্রদায়গত এই চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে সমন্বয় ভাবনার ক্ষীণতর হলেও প্রান্তিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রদায়িকতার উগ্র দাম্ভিক রথে সওয়ার হয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গার রক্তে ভারত বিভাজিত হল, দ্বিখন্ডিত হল বাঙালি মুসলিমের জাতীয়তাবাদ। তবে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট যে বাঙালি মুসলমানের দিকভ্রষ্ট জাতীয়তাবাদের অপমৃত্যু ঘটেছিল ১৯৭১ ধর্মের বিরুদ্ধে, ভাষার শৃঙ্খলে বলিয়ান বাঙালি জাতির ঘুরে দাঁড়ানো, আসলে বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদের উজ্জল এবং যথার্থ শুভ পরিণতি।

References (গ্রন্থপঞ্জি)

Absar, A. B. M. Nurul. (2014). Muslim Identity, Bengali Nationalism: An Analysis of Nationalism in Bangladesh. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, MCRE Publishing, Rome- Italy.ISSN 2281-3993, VOL-3 NO- 1.

Ahmed, Rafiuddin. (1981). The Bengali Muslims 1871-1906: A Quest for Identity. Oxford University press.

Anderson, Benedict. (1983). Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London.

Gellner, Ernest. (1983). Nations and nationalism. London.

Hobsbawm, Eric. (1990). Nations and Nationalism since 1780: Programme Myth, Reality. Cambridge.

Huchinson, John and Smith, Anthony D. Ed. (1994). Nationalism. Oxford Readers. Oxford University Press.

Hunter, W. W. (1871). The Indian Musalmans.London.

Islam, Sirajul. Ed. (1992). History of Bangladesh (1704-1971), VOL-1 Asiatic Society of Bangladesh.

Khan, Zillur R. (1985). Islam and Bengali Nationalism. Asian Survey, VOL-25, NO-8, pp834-851, University of California Press.

Kymlicka, Will. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford University press.

আহমেদ, ওয়াকিল। (১৯৮৩)। উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা। প্রথম খন্ড।নিউ দিল্লি: সাহিত্য একাডেমি।

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান। (১৯৯৭)। সংস্কৃতির ভাঙা সেতু। ঢাকা: নয়া উদ্যোগ।

ইসলাম, সিরাজুল। (১৯৯৩)। বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

উমর, বদরুদ্দীন। (২০১৮)। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

করিম, আবদুল। (২০১৫)। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। (২০০০)। বাঙালির জাতীয়তাবাদ। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

দাশগুপ্ত, সুরজিৎ। (১৯৯১)। ভারতবর্ষ ও ইসলাম। কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরী

দে, অমলেন্দু। (১৯৭৪)। বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। কলিকাতা: রত্না প্রকাশন।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ। (১৯৭৬)। বাঙালির ইতিহাস। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

বিশ্বাস, উষাপতি। (২০০০)। মুসলমান সমাজ ও বাংলা নাটক। কলকাতা: মুখার্জি পাবলিশিং।

মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল। (২০১২)। বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ। ঢাকা: কথামালা।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। (১৯৪৫)। বাংলাদেশের ইতিহাস। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স।

মুরশিদ, গোলাম। (২০০৬)। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি। ঢাকা: অবসর

রায়, অন্নদাশঙ্কর। (১৩৯৯)। যুক্তবঙ্গের স্মৃতি। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

রায়, এম. এন। (২০০৬)। অনুবাদ বদিউর রহমান, ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা। ঢাকা: প্যাপিরাস।

রায়মন্ডল, প্রথমা। (১৯৯৬)। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি- প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব। প্রতীক বুকস।

সাদ উল্লাহ। (২০১৪)। বাঙালি ও ইসলাম। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

সেন, দীনেশচন্দ্র। (১৯৯৩)। বৃহৎ বঙ্গ। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

সেন, সত্যেন। (২০১৭)। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

সফা, আহমেদ। (১৯৮১)। বাঙালি মুসলমানের মন। ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।

সুর, অতুল। (২০১২)। বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন। কলিকাতা: সাহিত্যলোক।

হাসান, জাহিরুল। (২০২২)। বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।